পাকুন্দিয়া থানার ঐতিহ্য

পাকুন্দিয়া উপজলোর উল্লখেযোগ্য ও র্দশনীয় স্থান

 এ উপজেলার এগারসিন্দুর নামক গ্রামটি একটি উল্লেখযোগ্য, প্রসিদ্ধ ও বিজয়গাঁথা ঐতিহাসিক জায়গা। এখানেই স্বাধীনতার চেতনায় উদ্ভুদ্ধ বাংলার বার ভূইয়ার প্রধান ঈশা খাঁ মাতৃভূমি সম্রাজ্যবাদী মোঘলদের কবল থেকে রক্ষা করতে দ্বিগ্বিজয়ী সম্রাট মহমতি আকবরের সুযোগ্য প্রধান সেনাপতি মানসিংহের সাথে মলয়যুদ্বে অবতীর্ন হয়ে তাকে পরাস্থ করে এক নব ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিলেন। এজন্যই কালের অবলিলায় স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে থাকা ঈশা খাঁ'র দূর্গটি দাড়িয়ে আছে আপন মহিমায়।

ইংরেজ বেনীয়াদের রাজত্বকালে এ এলাকার হতদরিদ্র কৃষকদের জোর করে ধান চাষের বদলে নীল চাষ করানোর জন্য নির্মম অত্যাচারের এক মূর্তমান প্রতীক হিসাবে নীল কুটিটি আজো দাড়িয়ে আছে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পাড়ে অবস্থিত বাহাদিয়া গ্রামে।

ষোড়শ শতকে মুসলিম অধ্যুষিত এগারসিন্দুর এলাকার গণমানুষের ধর্মীয় কর্মকান্ডের জন্য সম্রাট শাহজাহানের আমলে টেরাকোটার অলংকরণে অনুপম স্থাপত্যে নির্মিত সাদি মসজিদটি পুরনো এতিহ্যবাহী স্থাপত্য শৈলিতে আজো ইসলাম ধর্মপ্রাণ গণমানুষের চেতনার প্রতীক হিসেবে দাড়িয়ে আছে - যা বর্তমানে সরকারের প্রত্নত্বাত্তিক বিভাগ কর্তৃক রক্ষনা বেক্ষণ হচ্ছে।

 পশ্চিমা দেশ থেকে এ দেশে শান্তরি ধর্ম ইসলাম প্রচারের জন্য কিছু আউলিয়া দরবেশ এসেছিলেন, তম্মধ্যে সৈয়দ মলংশাহ্‌ একজন। সৈয়দ মলংশাহ্‌ বনজঙ্গল বেষ্টিত পাকুন্দিয়ার এই অঞ্চলের মানুষের মাঝে ইসলামের অমোগ বাণী প্রচারের জন্য তিনি আস্তানা গেরেছিলেন। তিনি অতীব সুন্দর, সহজবোধ্য ভাবে সুললিত কন্ঠে ইসলামের বিভিন্ন তথ্য ও আল্লাহ প্রদত্ত কিছু বাণীর তর্জমা করতেন। তাঁর গরুগার্ম্ভীয চলাফেরা ভ্রাতৃত্ব পূর্ণ পরিবেশে সৌহার্দপূর্ণ আচরণের জন্য এ এলাকার ইসলাম ধর্মপ্রাণ প্রিয় মানুষেরা তাঁকে হৃদয় মন দিয়ে ভালোবাসত এবং অকৃত্রিম ভাবে শ্রদ্ধা করত। একদিন জঙ্গলের পার্শ্বে এক উন্মোক্ত স্থানে তাঁর ভক্ত ও অনুসারীদের মাঝে ইসলামের তাৎপর্যপূর্ণ বাণী শুনাচ্ছিলেন। হঠাৎ জঙ্গল থেকে একটি ব্যাঘ্র এসে তাঁর এক ভক্তকে আক্রমণ করে বসে। তিনি তৎক্ষনাৎ দ্রুত দৌড়ে গিয়ে বজ্রের মত খালি হাতে বাঘের গালে এক থাপ্পর দেন। তাঁর থাপ্পর খেয়ে বাঘ প্রাণ ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর থেকে তাঁর ভক্ত ও অনুসারীরা তাঁকে ধর্মীয় আধ্যাত্বিক চেতনায় একজন সমৃদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে মনে করত এবং তাঁকে "পাকুয়ান" বলে প্রচার করত। তিনি এ এলাকার মানুষের ভালবাসার কারণে অন্য এলাকায় যেতে না পেরে স্থায়ী ভাবে এ পাকুন্দিয়ায় অবস্থান করেন। তিনি পরলোকগমন করলে তাঁকে পাকুন্দিয়া বাজারের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পাকুন্দিয়া -মির্জাপুর পাকা রাস্তার পশ্চিমপার্শ্বে সমাহিত করা হয়। অতঃপর তাঁকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মররে মানুষের কাছে এক মহিয়ান ব্যক্তি হিসাবে চরিজাগরুক করে রাখার জন্য তাঁর রওজাকে এ এলাকার মানুষ শ্রদ্ধার সাথে সংরক্ষণ করে আসছে। তাইতো সৈয়দ মলংশাহ্‌ একজন উল্লখেযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

ঐতিহাসিক এগারসিন্দুরের রণাঙ্গণে মল্লযুদ্ধে পরাজিত হয়ে মোঘল প্রধান সেনাপতি মানসিংহ লৌহ মানব ঈশা খাঁ'র মহানুভবতার জন্য সম্রাট আকবরের দরবার থেকে পুরস্কার হিসাবে ২২পরগণার জমিদারী নিয়ে আসার পথে উৎফুল্ল ঈশা খাঁ তার মনের মানুষ দীর্ঘ দিনের প্রেমিকা সোনামনিকে বিয়ে করার জন্য ঢাকা থেকে পান, সুপারি, মিষ্টি,উপঢৌকন ও বিয়ের সামগ্রী নিয়ে কোষার বহর নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে জঙ্গলবাড়ী অভিমুখে প্রবাহিত হওয়া নদী বেয়ে যাওয়ার সময় ভোর বেলা তিনি হঠাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পরেন। তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখতে পান জলের অভিষ্টাত্রী স্বয়ং গংগা দেবী তাকে বলছেন, হে ঈশা খাঁ তুমিতো আগামী কাল আমার বোনঝি সোনামনিকে বিয়ে করতে যাচ্ছ, আর তাকে বিয়ে করার জন্য অনেক মিষ্টি ভর্তি কোষা নিয়ে যাচ্ছ,সামনের কুঁড়ে আমার জন্য কিছু মিষ্টি দিয়ে যেয়ো। ঈশা খাঁ'র তন্দ্রা ভেঙ্গে গেলে তাঁর স্বপ্নের কথা সহযাত্রী কাউকে বলার পূর্বে যখন কুঁড় পাড় হয়ে যায় যায় ঠিক তখন হঠাৎ মিষ্টি ভর্তি একটি কোষা পানির নিচে তলিয়ে যেতে থাকে। ঈশা খাঁ তার বহরে থাকা অনেক শিকল ও ডুবুরী ব্যবহার করেও আর কোষাটিকে উদ্ধার করতে পারেননি। ব্যর্থ মনোরথ নিয়ে তাঁর চলে যাওয়ার দীর্ঘকাল পর চলমান নদীটি কালের আবর্তে বিলিন হয়ে চর এলাকায় পরিনত হতে থাকলে হঠাৎ একদিন মাটির নিচ থেকে কোষাআকৃতির একটি মাটির টিলা মাটির উপরে উঠে এসে- সৃষ্ট্রলিগ্ন থেকে এ যাবৎ কোষা আবির্ভাবের কথা রহস্যের অন্তরালে আজও বিরাজমান। তবে লোক মুখে প্রচারিত আছে যে, এ কোষার দুমাথায় দ্বৈব গজে উঠা তাল গাছ দু'টোর পাতায় প্রতি মাসের পূর্ণিমার রাতে আলোর ঝলকানি দেখা যায়। এগারসিন্দুরের সামান্তরাজ রাজা আজাহাবাকে এক যুদ্ধে পরাস্থ করে অপর একজন কুচ সামন্ত বেবুদ রাজা নগর হাজরাদী এলাকায় তার করায়ত্বে আনার পর এগারসিন্দুর নামক এলকাকে তার রাজত্বের রাজধানী করে এগারসিন্দুরের ব্যপক উন্নতি সাধন করেন। যতদূর জানা যায় তিনি তার রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে একটি বিশাল আকারের পুকুর খনন করেন। অবিশ্বাষ্য জনক ঘটনা এই যে, পুকুর খনন করার পর পুকুর থেকে আর পানি উঠে নি। বেবুদ রাজার স্ত্রী একদিন স্বপ্নে দেখতে পান যে, গঙ্গাদেবী রাণীকে তার কাছে আহ্বান জানিয়ে বলছেন যে, "তুমি আমার কথা মত চিরতরে আমার কাছে চলে আসার জন্য জলশূন্য পুকুরে কলসি কাঁকে নিয়ে এসে পুকুরের তলদেশে তোমার পদস্পর্শ করলে পুকুরে পানি উঠবে। রাণী মা জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, আমি চলে গেলে আমার শিশু বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবে কে? উত্তরে তিনি জানান যে, তোমার বাম হাতের তর্জনীতে থাকা সোনার আংটি জল স্পর্শ করে তোমাকে ডাকলে, তুমি মানব আকৃতিতে তোমার সন্তানকে দুধ খাওয়ানো সহ তাকে আদর সেবা করতে পারবে। পরদিন তার স্বপ্নের কথা রাজাকে জানালে রাজা স্বপ্নের বর্ণনানুযায়ী পুকুরের ঘাটে এসে রানীর বাম তর্জনীর আংটিটি রাজার হাতে দিয়ে কলসি কাঁকে পুকুরের তলায় পদস্পর্শ করার সাথে সাথেই পুকুরে পানি উঠে ভরে যায়- আর সেই সাথে রানী নিখুঁজ হয়ে যায়। স্বপ্নের বর্ণানুযায়ী যখনই রাজার সন্তান খাবারের জন্য কান্না করত তখন রাজা ঐ আংটিটি হাতে নিয়ে ঘাটে এসে জল স্পর্শ করে ডাক দিলেই রানী মানব আকৃতিতেই উঠে আসতেন এবং তার সন্তানকে দুধ খাইয়ে আবার চলে যেতেন। বেবুদ রাজার এক ঘনিষ্ট সহচর বন্ধু ছিল ; যার কাছে তিনি আত্মবিশ্বাস্যের তার প্রকাশ্য গোপন সকল কথা বলে মনটাকে হালকা করতেন। রাণী পানিতে অন্তধান ও তার আংটির রহস্যময় জাদুঘরি কর্মের কথা তার কাছে বললে, সে বাস্তবে তার প্রমাণ দেখতে চাইলে তিনি পূর্ব নিয়মে রাণীকে পানি থেকে স্ব- শরীরে উঠে আসার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সে কুমতলবে রাজার হাত থেকে কৌশলে আংটিটি চুরি করে নিয়ে যায়। বেশী দূর যেতে পারে নি। অল্প কিছু দূর গেলে আংটিটি তার হাত থেকে পড়ে যায় এবং পূর্ব রূপে এই এলাকা মাটি সরে গিয়ে গর্তের সৃষ্টি হয় এবং পানিতে একাকার হয়ে যায়। আংটি চুরির ফলে সৃষ্ট এ জলাশয়টিই হল আংটি চুরার বিল। আংটি হারিয়ে রাজা আর পুকুর ঘাটে এসে রাণীকে শত ডেকেও আর রাণীর দেখা পাননি। রাণীকে হারিয়ে রাজা একাকিত্বে দুঃখ কষ্টে ক্রমেই দূবরল হয়ে পড়েন। গায়েবীভাবে পুকুরে পানি উঠার কারণে আজো মানুষের বেবুদ রাজার পুকুর পাড়ে গিয়ে কি যেন এক অজানা ভয়ে শহিরিয়াহ উঠে।

ইসলামী শিক্ষাকে বেগবান করার জন্য ১৮০০খ্রিঃ মরহুম নাজিম উদ্দিন খন্দকার এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে প্রায় দুইশত বছর পূর্বে মোঃ মোংগল নামে এক ধর্মীয় চেতনার উজ্জীবিত কামেল দরবেশ বর্তমান মাদ্রাসার স্থানে আস্তানা তৈরী করেছিলেন। এ আধ্যাত্নিক সাধকের নাম অনুসারে মংগলবাড়ীয়ার নাম হয়। ১৮৭২ সালে মরহুম আক্তারুজ্জামান এ মাদ্রাসার প্রথম সরকারী মঞ্জুরী লাভ করেন। কালের আবর্তে এ মাদ্রাসাটি আজ পাকুন্দিয়া উপজেলার একমাত্র কামিল মাদ্রাসা।

 সম্রাট আওরাঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুসলমানদের নামাজ আদায়ের জন্য মোঘল স্থাপত্ব শৈলিতে নির্মিত হয় ঐতিহাসিক সালংকা মসজিদ। মসজিদটি কালের আবর্তে আজ নামাজ আদায়ের অনুপযোগী এবং প্রায় ধ্বংশের পথে।

উল্লেখ্যযোগ্য প্রতিবেদন

শিক্ষা, সাংস্কৃতি,সৌর্য্য ও ঐতিহ্যময় ঐতিহাসিক বিজয় গাথা এ পাকুন্দিয়া। সুদীর্ঘ কাল থেকে ভারত উপমহাদেশে সর্বত্র একটি সকলের নিকট পরিচিত নাম ছিল। ইয়েমেনের পরিভাজক ইভনেবতুতা বার শতকের কোন এক সময় এ এলাকা পরিভ্রমণ কালে তাঁর বর্ণনা মোতাবেক পাকুন্দিয়া এলাকা ছিল। ঐশ্বর্য্য ধন ও সম্পদের পরিপূর্ণ একটি সমৃদ্ধ এলাকা। যার প্রমাণ পরবর্তীতে কবি নিত্যান্দদাস বিরচিত প্রেম বিলাশ নামক কাব্যের অনেক জায়গায় একিরূপে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষার প্রতি অনুরাগী এ পাকুন্দিয়ার বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা কিশোরগঞ্জ এর সবচেয়ে শিক্ষায় সমৃদ্ধ এলাকা হিসাবে পরিচিত। সংগত কারনেই বিপুল সংখ্যক সুশিক্ষিত মানুষের পদচারনায় যখন পাকুন্দিয়া উপজেলা সদর এলাকা মুখরিত তখন পাকুন্দিয়া উপজেলার কেন্দ্র বিন্দু উপকন্ঠ বেয়ে কিশোরগঞ্জ টু ঢাকা পাকা রাস্তা যা পাকুন্দিয়া থানা কার্যালয়ের সম্মুখে এসে দুই ভাবে বিভক্ত হয়ে

পাকুন্দিয়া টু মঠখোলা এবং পাকুন্দিয়া টু মির্জাপুর দুটি পাকা রাস্তা দীর্ঘদিন থেকে এ এলাকার গণমানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ প্রজন্মের মানুষের চাহিদা মেটাতে বিগত ৫বৎসর থেকে ঢাকা শহরে যাতায়াতের জন্য বহুবিধ দুরপাল্লার বাস সার্ভিস সহ অন্যান্য যানবাহন চলাচল করে আসছে। দিন বদলের এই সন্ধিক্ষনে মানুষের ভারে আজ পাকুন্দিয়া উপজেলা শহরের ব্যস্ততা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তার প্রস্থতা সংকীর্ণ থাকায় দুরপাল্লার বাস গুলি ঝুকি পূর্ণ ভাবে চলতে গিয়ে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। ফলে এক দিকে যেমন জীবনাবসানসহ মানুষের অপুরনীয় ক্ষতি হচ্ছে। অন্য দিকে মূল্যবান যানবাহন সমূহ বিকল হয়ে অকেজো হয়ে যাচ্ছে। তাইতো আজ পাকুন্দিয়া উপজেলা শহরবাসীর সর্বসাধারণের প্রাণের দাবী একটি বাইপাস রোড। চাহিদার অন্ত নেই। তবে এ এলাকাবাসীর এখন প্রাণের একমাত্র দাবী বাই পাস রোড। এলাকাবাসী সর্বন্তকরণে আশা করে যে, বর্তমান সদাশয় সরকার উক্ত চাহিদা পুরণে প্রয়োজনীয় সদয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।